সংবাদ

তারিখ 13 JAN 20.3...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বইমেলা ও জাতীয় গ্রন্থাগার বর্ষ

প্রথা অনুযায়ী বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি ঢাকা বইমেলা শুরু হয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি; কিন্তু এবার বইমেলাটি মোটেই জমেনি বলে প্রকাশক ও বিক্রেতাদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মেলা না জমার প্রথম কারণ মেলার স্থান, দ্বিতীয় কারণ আবহাওয়া এবং তৃতীয় কারণ প্রতিকূল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। বহু বছর ধরে ঢাকা বইমেলা চলে আসলেও এখন পর্যন্ত তার স্থান নির্দিষ্ট করা যায়নি। এ কারণে একেক বছর একেক স্থানে বইমেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবারের মেলাস্থল প্যারেড গ্রাউন্ড ঢাকার কেন্দ্র থেকে দূরে, তদুপরি যাতায়াত সমস্যা তো আছেই। বই পড়ুয়া ও ক্রেতাদের বড় অংশ যে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত তারা রিকশা-বাসে চলাচল করে। রোকেয়া সরণিতে রিকশা চলাচল করলেও যে রাস্তাগুলো সে সরণিতে গিয়ে মিলেছে সেসব রাস্তায় রিকশা চলে না। ফলে রিকশাযাত্রীদের পক্ষে সহজে প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছা সম্ভব নয়। পহেলা জানুয়ারি থেকে বেবিট্যাক্সিও শহরে দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আবহাওয়াগত সমস্যাটির ওপর অবশ্য মানুষের হাত নেই। বইমেলার প্রায় পুরোটাই শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে কেটে গেল। তৃতীয় সমস্যাটি বেশ গুরুতর। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক ধরনের নৈরাজ্য চলছে। প্রথম সুযোগেই সরকার ভিন্নমতের লেখক-শিল্পীদের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত করেছে। এরপর শুরু হয়েছে তাদের কারো কারো ওপর হয়রানি ও জেল-জুলুম। তুচ্ছ অজুহাত দেখিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে সংস্কৃতি সেবীদের। দেশীয় গ্রন্থশিল্প বিকাশের লক্ষ্যে বিগত সরকার সৃজনশীল গ্রন্থ ক্রয়ের যে প্রকল্প শুরু করেছিল জোট সরকার তারও বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। সৃজনশীল ও শিশুতোষ গ্রন্থের নামে সরকার এমন সব বই কিনেছে যা সাহিত্য বিকাশে সহায়ক তো নয়ই বরং শিশু-কিশোরদের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সৃজনশীল সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতিকে রাজনীতির খড়্গে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার কাজটি সরকার সুচারুভাবে করে যাচ্ছে। ফলে ঢাকা বইমেলা আর লেখক-পাঠকদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে না। প্রকাশক ও বিক্রেতারাও মুখ বেজার ও মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন। ঢাকা বইমেলার এ দীনদশা আমাদের পুস্তক শিল্পের জন্য এক অশনি সঙ্কেতই বটে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বইমেলা উদ্বোধনকালে দুই হাজার তিন সালকে জাতীয় গ্রন্থাগার বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এমন এক সময়ে এ ঘোষণা দিলেন যখন দেশের গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলো অযত্নে অবহেলায় ধ্বংসের পথে। সরকারি গ্রন্থাগারগুলোতেও চেয়ার-টেবিল নেই, চেয়ার-টেবিল আছে তো ভাল বই নেই। এসব গ্রন্থাগারে পাঠককে উৎসাহিত করার বদলে নিরুৎসাহিত করা হয়। গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মাসশেষে বেতন নিয়েই সন্তুষ্ট। পাঠকদের প্রয়োজনীয় বই ও চেয়ার-টেবিল নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। জাতীয় গ্রন্থ বর্ষে সরকারিখাতে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করলেও সরকার গ্রন্থ বিকাশে তথা পাঠাভ্যাস বাড়াতে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

জাতীয় গ্রন্থাগার বর্ষ ঘোষণার মধ্য দিয়ে সরকার কি করতে চায় তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ ব্যাপারে সরকার বিস্তারিত কোন কর্মসূচি ও পরিকল্পনার কথাও জানায়নি। বড় বড় বুলি না আউড়িয়ে দেশের জরাজীর্ণ গ্রন্থাগারগুলো সংস্কারে উদ্যোগী হলে সেগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে। পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলোতে আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়ক বইপত্র সরবরাহ করলে কিছুটা হলেও গ্রন্থাগার বর্ষ ঘোষণার যৌক্তিকতা থাকবে। অন্যথায় সরকারের আরও বহু দিবস ও বর্ষ ঘোষণার মতো এটিও বাগাড়ম্বর বলে জনগণের কাছে প্রতীয়মান হবে।